ভূমিকা

মানুষ নিজের কথা বলতে চায়। নিজের ভাবনা পৌঁছে দিতে চায় অপরের কাছে। এই আন্তর্তাগিদ থেকেই মানুষের মধ্যে সামাজিকতার বিস্তার। তার ব্যক্তিত্বে একটা অন্তরঙ্গ দ্বীপ নিশ্চয়ই থাকে, কিন্তু সেই দ্বৈপায়ন চরিত্র মুখরতা পায় পরিপার্শ্বের তরঙ্গের আন্দোলনে। নিজেকে অভিব্যক্ত করার পিছনে প্রয়োজনের তাগিদ তো থাকেই, থাকে তদতিরিক্ত কিছু ব্যাকুলতাও। প্রকাশের আর্তি থেকেই মানুষ অন্বেষণ করে নেয় রকমারি ভাষা মাধ্যম। পত্র বা লিপি তারই অন্যতম। আমাদের শিল্পে সাহিত্যে পত্রকে একটি উপকরণ-কৌশল হিসেবে ব্যবহার করার রীতি একালের উদ্ভাবন নয়। লিপি-লিখনে মগ্ন নায়িকা-মূর্তি প্রাচীন চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে অপরূপ অবয়ব পেয়েছে। পাষাণী পত্রলেখা আজও খাজুরাহের পরম বিস্ময়। নারী পুরুষের প্রেম বিরহে লিপি বিনিময় রোমান্টিকতার সফল সঞ্চারী। ডাক-ব্যবস্থার অপ্রচলনের কালেও অলঙ্ঘ্য দূরত্বজনিত বিচ্ছেদ কবিকল্পনার উদাত্ত গতিকে বারিত করতে পারে নি। মেঘদূত হংসদূতের সমাগম সেই কারণেই। কবি হিসেবে কালিদাস অচেতন মেঘকে সচেতন করেছেন বিরহী যক্ষের বার্তাবাহক হিসেবে। নাট্য রচনাতেও প্রেমের রোমান্টিকতা বর্জিত হয় নি। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের তপোবনবাসিনী শকুন্তলা প্রেমের আকুতি জানিয়ে পত্র লিখেছে রাজা দুষ্মন্তের উদ্দেশ্যে।

তব ন জানে হৃদয়ং মম পুনঃ কামো দিবাপি রাত্রাবপি
নির্ঘৃণ তপতি বলীয়ঃ ত্বয়ি বৃত্ত মনোরথানি অঙ্গানি। [১]

অর্থাৎ — "ওগো নিষ্ঠুর, তোমার মনের কথা আমি জানি না, কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলনে উৎসুক আমার দেহকে কামদেব দিনরাত ভীষণভাবে সন্তপ্ত করছে"। দেবতার প্রসাদের ছলে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে এই গোপন প্রেমপত্র পাঠাতে হয়েছিল শকুন্তলাকে। সহায়তা করেছিল তার দুই সখী। 'শ্রীমদ্ভাগবতে' স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণী 'গুহ্য সন্দেশ' প্রেরণ করেছিলেন পত্রের মাধ্যমে।

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাংতে নির্বিশ্য কর্ণ বিবরৈর্হর্বতোহঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপংমে।[২]

অর্থাৎ — হে ভুবনসুন্দর! হে অচ্যুত! তোমার যে গুণাবলীর কথা শ্রবণকারীগণের কর্ণরন্ধ্রের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে শরীরের তাপ হরণ করে (স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়প্রকার শরীরের সকল সন্তাপ দূর করে) এবং তোমার যে রূপ চক্ষুষ্মানজনের চক্ষু: প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ সর্বার্থ লাভ ঘটায়, লোকমুখে তোমার সেই গুণাবলী ও অপরূপ রূপের কথা শ্রবণ করে লজ্জাহীন আমার মন তোমাতেই আবিষ্ট হয়েছে।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের পত্র ব্যবহারের রীতিকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন মধ্যযুগের বাঙালি কবিরা। তাঁদের কাব্যকথায় কিছু কিছু পত্র প্রসঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ যুগে জন্মালে যিনি ঔপন্যাসিক হতে পারতেন বলে সমালোচকদের ধারণা সেই কবি মুকুন্দের 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে দুটি পত্র এসেছে বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে। সরলা নিষ্পাপ খুল্লনা সতীন লহনার প্রিয়পাত্রী নয় বরং বলা যায় পথের কাঁটা। তাই স্বামী ধনপতি সওদাগরের বিদেশ যাত্রার সুযোগে খুল্লনাকে যন্ত্রণা দেবার অভিলাষে লহনা তার দাসীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটি 'কপট পত্রিকাভাস' প্রস্তুত করেছে। ধনপতি যেন খুল্লনা সম্পর্কে কৃত্য নির্দেশ জারি করে লহনাকে পত্র লিখছেন। স্বামীর আদেশ পতিব্রতা খুল্লনার পক্ষে অবশ্যই শিরোধার্য হবে, এই বিশ্বাস থেকেই ছলনা

পত্রটি লেখা —

তোমারে লাগয়ে সর্ব গৃহস্থের ভার।
খুল্লনার নিবে তুমি অষ্ট অলঙ্কার।।
একে একে কাড়ি নিবে অঙ্গ আভরণে।
নিযুক্ত করিবে তারে ছাগ রক্ষণে।।
বিবাহ করিল যবে লগ্ন ছিল কেতু।
রাখাবে ছাগল পাপ প্রতিকার হেতু।। [৩]

সপত্নীকন্টক দূর করার জন্য কত কৌশলে মিথ্যে কথার জাল বোনা যায় লহনার পত্রটি তারই প্রমাণ। এই কাব্যেরই দ্বিতীয় আরেকটি পত্রে দেখা যায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিংহল যাত্রার পূর্বে ধনপতি সওদাগর জানতে পারেন, স্ত্রী খুল্লনা অন্তঃসত্ত্বা। তাঁর অনুপস্থিতিতেও ভূমিষ্ঠ সন্তান যাতে যথাযথ স্বীকৃতি পায় তারই জন্য 'জয়পত্র' লিখে তিনি খুল্লনার হাতে তুলে দেন। তাতে আগামী দিনের জন্য সওদাগরের পক্ষ থেকে জরুরি কিছু নির্দেশ লিপিবদ্ধ ছিল —

তোমারে আর্শীবাদ প্রিয়ে পরম পিরিতি।
সন্দেহভঞ্জন পত্র করিয়ে লিখিতি।।
জখন তোমার গর্ভ হইল পঞ্চমাস।
হেন কালে নৃপাদেশে দীর্ঘ পরবাস।।
জদি কন্যা হয় শশিকলা নাম থোবে।
দেখিয়া উত্তম বরে তার বিহা দিবে।
জদি পুত্র হয় তবে নাম থোবে শ্রিয়পতি।
পড়্যায়্যা শুন্যায়্যা পুত্রে করিবে সুমতি।।
এ বার বৎসরে জদি নহে আগমন।
আমার উদ্দেশ্যে জাবে দক্ষিণ পাটন।। [৪]

মধ্যযুগীয় জীবনীকাব্যেও পত্রের প্রয়োগ লক্ষণীয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অন্ত্যলীলার উনিশতম পরিচ্ছেদে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও ভূমিকা সম্বলিত একটি পত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেটি চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত গোঁসাই-এর লেখা। পত্র প্রেরিত হয়েছে ভক্ত জগদানন্দের মাধ্যমে। পত্রটি প্রহেলিকার আবরণে লেখা যাতে একমাত্র চৈতন্যদেবই তার মর্ম উদ্ধার করতে পারেন। পত্রে নিবেদিত বক্তব্যটি এইরূপ —

বাউলকে কহিয় লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল।। [৫]

প্রাগাধুনিক যুগের অন্তিম পর্বে 'বিদ্যাসুন্দরে'র আদিরসাত্মক কাহিনিতে নাটকীয় রোমাঞ্চের উপাদান যুগিয়েছে বিদ্যা ও সুন্দরের গোপন পত্র বিনিময়। রাজকুমার সুন্দর নায়িকা বিদ্যার সন্ধানে বীরসিংহের রাজপুরীতে উপস্থিত হয়ে এক মালিনীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। বিদ্যার ফুল যোগাত এই মালিনী। একদিন সুন্দর নিজেই মালা গেঁথে তার মধ্যে কৌশলে আত্মপরিচয় দিয়ে একটি গোপন চিঠি পাঠিয়েছিল এবং সেই পত্রপাঠের পরেই সুন্দরের সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল বিদ্যা। মধ্যযুগের লোকায়ত

কথা-গানেও পত্রের উল্লেখ নেই এমন নয়। ময়মনসিংহগীতিকার গাথা গুলিতে পত্র ব্যবহারের নজির আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'মলুয়া' শিরোনামের পালাগানে মহুয়া তার ভাই-এর কাছে 'আড়াই অক্ষর' অর্থাৎ অতি স্বল্প কথায় নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করেছে। 'চন্দ্রাবতী' গাথায় প্রার্থিত প্রেমিকা চন্দ্রাবতীর উদ্দেশ্যে 'পত্র লেখে জয়ানন্দ মনের যত কথা'। সত্যিই তো হৃদয়ের মুখর আবেগ ব্যক্ত করার জন্য পত্রের মতো আর কোন্ মাধ্যমই বা এমন উপযুক্ত হতে পারে। জয়ানন্দের পাঠানো প্রেমলিপি নিরালায় বসে পাঠ করে চন্দ্রাবতী। কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের নারী হিসেবে তার পক্ষে কতটাই বা অগ্রসর হওয়া সম্ভব! উত্তরে তাই চন্দ্রাবতী লেখে তার অসহায়তার কথা —

"ঘরে আছে বাপ আমি কি বা জানি —
আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী।"[৬]

বাইরে যতই সতর্কতা অবলম্বন করুক না কেন চন্দ্রাবতীর হৃদয় আসলে জয়ানন্দের জন্য উন্মুখ। কিন্তু জয়ানন্দ কি তেমন বিশ্বাসভাজন পুরুষ? তা নয় বলেই তার মধ্যে দ্বিচারিতা দেখা যায়। চন্দ্রবতীর প্রতি মুগ্ধতার বশে যেমন সে পত্র প্রেরণ করে, তেমনি আবার এক যবন কন্যার প্রতি আকস্মিক মুগ্ধতায় তার উদ্দেশ্যেও সে পত্র পাঠাতে দ্বিধা করে না। কিন্তু তারপর তার জীবনে অনুতাপের পালা শুরু হয়। আর তাই ক্ষমা প্রার্থনা করে আবারও সে চিঠি লেখে তার পূর্ব প্রেমিকা চন্দ্রাবতীর উদ্দেশ্যে। এবার অবশ্য চন্দ্রাবতী বিশ্বাসঘাতক পুরুষের প্রেমের ফাঁদে আর পা বাড়াতে চায় না। ফল হয় বিয়োগান্ত। পত্র ব্যবহারের এমন নিদর্শন ময়মনসিংহগীতিকার 'কমলা' নামক গাথাতেও মেলে। সেটি কমলার উদ্দেশ্যে লেখা কারকুনের প্রেমপত্র। মধ্যযুগীয় কাব্যের পত্র ব্যবহারের এই স্বল্প নিদর্শন আধুনিক যুগপটভূমিতে এসে স্বভাবতই অনেক বেশি বিস্তার লাভ করে। কারণ এ যুগের সাহিত্যিকেরা ক্রমেই বাইরের ঘটনা থেকে মানুষের অন্তর-রহস্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন। জটিল জীবন কথার আধার হিসেবে একালে কথাসাহিত্য প্রকৃত অর্থে জন্ম নেবার আগে নারী-মনস্তত্ত্বের বিচিত্র উন্মোচনে কবি মধুসূদন প্রত্নপ্রতিমাদের স্থাপন করেছিলেন "বীরাঙ্গনার" পত্রসংকলনে। পত্রকে আরও বাস্তবের অনুগামী করল গদ্য মাধ্যম। পত্রের প্রয়োগরীতির কৌশল সবিশেষ কার্যকারিতা পেল কথাসাহিত্যের বয়নে।

আধুনিক জীবনকে প্রশস্ত ব্যাপ্তিতে ধারণ করার সবচেয়ে উপযোগী সাহিত্যিক রূপকলা নিঃসন্দেহে উপন্যাস। একালের জীবনের মতোই ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে চলেছে তার নির্মাণ। শিল্পের এই ইমারতটি গড়তে ঔপন্যাসিকেরা যে সমস্ত উপাদান প্রয়োগ করেছেন, পত্র তার মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যে অঙ্গীকৃত। একটি স্বতন্ত্র সংরূপ হিসেবে বাংলা উপন্যাস তার ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই কাহিনি ও চরিত্রের নানা দাবি পূরণে চিঠিপত্রকে আখ্যানের বিন্যাসের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।

বাংলা উপন্যাসের যে কোন প্রসঙ্গ আলোচনায় একটি অবধারিত সত্যকে স্বীকার করে নেওয়াই ভালো, আমাদের উনিশ শতকীয় নভেল সংস্কৃত কথাকাহিনি অথবা অনাধুনিক বাংলা মঙ্গলগান পালাগান বা গীতিকা থেকে জন্ম নেয় নি। অবশ্যই তা ইউরোপীয় উপন্যাসের ঔরসজাত। ইতালীয় রেনেসাঁস যুগের নুভেলা বা স্পেনীয় পিকারেস্ক জাতীয় রচনার ধারা বেয়ে ইংলন্ডে নভেল রচনার প্রথম সূত্রপাত ঘটে। এর আবির্ভাবের প্রেরণামূলে কাজ করেছিল শিল্প-বিপ্লবজাত সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পটভূমি। ইংরেজী উপন্যাসে জন্মলগ্ন থেকেই পত্র জড়িয়ে আছে নাড়ির বন্ধনে। দুজন গ্রন্থ ব্যবসায়ীর নির্দেশ অনুসারে স্যামুয়েল রিচার্ডসন একখন্ড Familiar letter লিখতে আরম্ভ করেন। সাধারণ স্বল্প শিক্ষিতদের পাঠোপযোগী করেই বইটিকে লিখতে বলা হয়েছিল এবং বিশেষভাবে মেয়েদের কথা ভেবে। প্রয়োজনের তাগিদে যাঁরা বাইরের জগতে জীবিকা গ্রহণে বাধ্য হন তাঁরা কী ভাবে কোন্ পথে চললে লাঞ্ছনা ও প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা পেতে

পারেন, নিজেদের বাঁচাতে পারেন, তারই নির্দেশিকা হিসেবে চিঠিগুলি লিখে দেওয়ার কথা ছিল। প্রকৃত অর্থে তা Utilitarian Publication। প্রকাশকদের শর্ত মতো চলতে গিয়ে রিচার্ডসন লিখে ফেললেন Pamela- or Virtue Rewarded। চিঠিকে কেন্দ্র করে উপন্যাস রীতির এক অভিনব নিরীক্ষা এখান থেকে শুরু হল। চিঠি অবশ্য এখানে নিছক মাধ্যম নয়, চিঠিকে আখ্যানের পট হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন রিচার্ডসন। উপন্যাসে চিঠিগুলি সৃষ্টি হয়েছে নায়িকা পামেলার হাতে। একজন পরিচারিকা কি ভাবে মনিবের গৃহিনী পদে প্রতিষ্ঠা পেল সেটাই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। চিঠির মাধ্যমে যেন আত্মজীবনী লিখছে পামেলা। পরিচারিকা হয়েও সে তার প্রভুর সব রকম লোভ আর কামনাকে নানা কৌশলে ঠেকিয়ে রেখে শেষ পর্যন্ত তার হৃদয়ে নিজের একটি মর্যাদাময় অবস্থান নির্ধারণ করে নিয়েছে। সমাজের শ্রেণীগত বিভেদকে অতিক্রম করে লেখক এখানে প্রেম এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহ বন্ধনকে মূল্য দিয়েছেন। চিঠি সেখানে পাত্র-পাত্রীর মানসিক দ্বন্দ্বকে প্রতিফলিত করেছে। লক্ষ করতে হবে এরপর রিচার্ডসনের চারখন্ডে রচিত 'ক্লারিশা হারলো' উপন্যাসটিও পত্ররীতিকে অবলম্বন করেছে। তবে পত্র ব্যবহারের পদ্ধতিতে ফারাক এসেছে। এ উপন্যাসে ক্লারিশা ও তার বান্ধবী হাউ-এর মধ্যে এবং লাভলেস ও বেলফোর্ডের মধ্যে যে পত্রালাপ চলেছে তাতে পত্র জিনিসটা যে একটা যুগল প্রক্রিয়া সে বিষয়ে সচেতনতা গড়ে উঠেছে। রিচার্ডসনের পত্রোপন্যাসের ধারাকে গ্রহণ করেন রুশো এবং গ্যেটে। দস্তয়ভস্কির বিখ্যাত রচনা 'পুওর ফোক' পত্ররীতিতে সৃষ্ট। ১৭৭৯ সালে শিলারকে একটি চিঠিতে এই ধরনের উপন্যাসের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে গ্যেটে অভিমত প্রকাশ করেছেন 'totally dramatic' হয়ে ওঠাই এদের বৈশিষ্ট্য।'

পত্রোপন্যাসের হাত ধরে ঔপন্যাসিক শিল্পকলার প্রাথমিক উদ্ভবের এই ইতিহাসকে স্মরণে রেখেও একটা কথা প্রাসঙ্গিক গুরুত্বে বুঝতে হবে, পত্রোপন্যাস আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। উপন্যাসে পত্রের ব্যবহারকে নানাদিক থেকে বিশ্লেষণ করার এবং অন্বেষণ করে নেবার তাগিদেই আমরা বর্তমান সন্দর্ভের পরিকল্পনা করেছি।

বাংলা উপন্যাসের প্রথম সফল পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র আখ্যানের সঙ্গে পত্রকে সংবদ্ধ করেছিলেন নিপুণ কারিগরিতে। পরবর্তী ঔপন্যাসিকেরা সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর উত্তরাধিকার। পর্ব থেকে পর্বান্তরে সময়ের মর্জি বদলের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের বিষয় এবং রীতিতেও লক্ষণীয় পালাবদল ঘটেছে। কিন্তু পত্রের অন্তর্ভুক্তি চলতেই থেকেছে — নিছক সংবাদ বহন থেকে শুরু করে ঘটনার যোগসূত্র রচনা অথবা বাঁক পরিবর্তন, ব্যক্তিসত্তার আবরণ উন্মোচন, অনুভূতির নানা স্তরের বিচিত্র স্পন্দনকে ধারণ — এই রকম নানা কারণে। চিঠি লেখার মৌল প্রয়োজনের উদ্ভব অবশ্যই স্থানিক দূরত্ব থেকে,কিন্তু মানসিক দূরত্বও পত্র-মাধ্যম অবলম্বনে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের নিকটতম মানুষটিকে আমরা কতটা জানি, নিজেকেই বা বুঝি কতটা? আধুনিক মানব মনস্তত্ত্ব আমাদের আপাত পরিচয়টাকে ভেঙে খানখান করে আমাদের আন্তর্রহস্যের অজস্র গোপন কুঠুরি আবিষ্কার করেছে, যে কথা আমরা মুখে বলি তার সঙ্গে আমাদের অন্তর্ভাবনার ফারাক বুঝিয়ে দিয়েছে, চেতনার গভীরে অবচেতনের সন্ধান নিয়েছে। পত্র অনেক সময় আমাদের মনোগহনের সেই গুহামুখ খুলে দেয়।

চিঠি এবং ডায়েরি দুটিই মানুষের আত্মকথার বাহন। কিন্তু পার্থক্য এখানেই যে ডায়েরি প্রকৃত পক্ষে নিজের জন্য লেখা, নিজের দৈনন্দিনকে হারিয়ে যেতে না দেওয়া। চিঠির ক্ষেত্রে প্রেরকের অপর প্রান্তে থাকেন প্রাপক। ফলে পত্রলেখকের সচেতনতা এক ভিন্ন মাত্রা পায়। ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব থাকে এই দ্বিবিধ ভূমিকার কথা স্মরণ রাখার। পত্রপ্রেরক পাত্র-পাত্রীকে যেমন তিনি আত্মবিশ্লেষণের অথবা আত্মোদ্‌ঘাটনের সুযোগ দিতে পারেন তেমনি কাহিনির প্রয়োজন অনুসারে প্রাপকের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণের অবকাশও তিনি

তৈরি করে নিতে পারেন। পত্রের উত্তর এবং প্রত্যুত্তর কাহিনিতে লক্ষণীয় সংযোজক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। দুয়ের পত্র আবার যখন তৃতীয় পক্ষের গোচরে আসে, প্রকাশ্যে অথবা গোপনে, তার মধ্যেও কাহিনির নতুন গ্রন্থি খোলার অথবা নাটকীয়তা সৃজনের অবকাশ থাকে।

পত্রের মধ্যে কখনো কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে আবরণ টানার চেষ্টাও দুর্লভ নয়। সেটিও মনস্তত্ত্বেরই একটা প্রক্রিয়া। প্রকৃত কথাকে গোপন রেখে ভিন্ন কথা বলার প্রয়াস থাকতে পারে, আবার যে দ্বন্দ্ব যে সংশয় মৌখিকভাবে অথবা সরাসরি অথবা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করা সম্ভব নয় তার সার্থক ধারক হয়ে ওঠে পত্র। মুখের ভাষায় সব কথা গুছিয়ে বলা যায় না। বাচনপটু না হলে তার মধ্যে অনেক ফাঁক থেকে যায়। অনেক কুণ্ঠা বা লজ্জা আত্মপ্রকাশকে দ্বিধাগ্রস্ত করে, বিপরীত পক্ষের পাল্টা যুক্তিতে অনেক সময় মুখের কথা খন্ডিত হবার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়। লিখিত পত্রের সুমিত বিন্যাসে এই সংকটগুলি অতিক্রম করা সম্ভব। আবার ভিন্ন দিক থেকে দেখলে পত্রের অস্থির অসংলগ্ন ভাষা জটিল বিক্ষিপ্ত মানসিকতার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। আর তাতেও খুলে যেতে পারে মনোবিকলনের পথ। ফলকথা, ঘটমান জীবনের মতো জীবনের কথাকাহিনিতেও পত্রের প্রকাশ বহুমুখী। তার প্রভাবও বিচিত্র।

উপন্যাসে পত্র ব্যবহারে প্রথম ও প্রধান বিচার্য বিষয় পত্রের প্রয়োগরীতির যথার্থতা। অনাবশ্যক অথবা অসঙ্গত উপকরণ যে কোনো শিল্পের ক্ষেত্রেই পরিহার্য্য, সুতরাং ঔপন্যাসিকের পক্ষে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক থাকা বিশেষ প্রয়োজন, যেমন, (১) পত্রের ভাষা যেন চরিত্রানুগ হয়, (২) চরিত্রভেদে প্রকাশের ভঙ্গিতে যেন ভিন্নতা আসে অর্থাৎ কণ্ঠের স্বরভেদটা এখানে জরুরি, (৩) পত্রের অবাঞ্ছিত জটিলতা আড়ম্বর বা দীর্ঘতা যেন ঘটনার অনায়াস গতিকে ব্যাহত না করে। বস্তুত প্রয়োগ কৌশলের উপরেই শিল্পোপকরণটির সার্থকতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কখনো কখনো ন্যূনতম দৈর্ঘের এমন কি এক পংক্তির পত্রও ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দিতে পরে। ছিন্ন পত্রাংশ অনেক গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত দিয়ে পাঠকের কৌতূহলের কেন্দ্রে উঠে আসতে পারে।

পত্র যে শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবন ব্যক্তিভাবনা বা ব্যক্তিসমস্যাকেন্দ্রিক হবে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। ব্যক্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার পরিবার, তার সমাজ, তার পারিপার্শ্বিক। জীবনের বৃত্তকে আরো প্রসারিত করে দেখলে প্রদেশ, দেশ, আন্তর্জাতিকতা সবই চলে আসতে পরে পত্রের প্রচ্ছায়ায়। "গ্লোবাল ভিলেজ"-এর অধিবাসী হিসেবে আমাদের কাছে আজ পত্রের সব স্থানিক সীমারেখাই মুছে গেছে। আর্থ সামাজিক অথবা রাজনৈতিক যে প্রেক্ষাপট ব্যক্তির পরিচায়নের মূল ভিত্তি, তার প্রভাবও স্বাভাবিক ভাবেই সক্রিয় হতে পারে পত্রের ভাষায় ও গঠনে।

ঔপন্যাসিকের কাছে একটি নিরপেক্ষ জীবনদৃষ্টি পাঠকের একান্ত প্রত্যাশিত। ব্যক্তির সংলাপের মত ব্যক্তির পত্র রচনাতেও সেই প্রার্থিত নিরপেক্ষতা লঙ্ঘিত হয় না এমন নয়। পাত্র-পাত্রীর ভাবনায় লেখকের ব্যক্তিগত মনন, দার্শনিকতা, জৈবনিক প্রত্যয় অথবা নীতিবোধ বহু সময় ছায়া ফেলে। লেখকের নিজস্ব চিন্তা যদি উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে অথবা চরিত্রের মূল প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে লেখকের বিরুদ্ধে অনধিকার হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠতেই পারে। কখনো কখনো লেখকের অভীষ্ট সম্পাদনের জন্য সম্পূর্ণ নেপথ্যচারী চরিত্রের কলমে পত্র উপস্থাপনার দৃষ্টান্ত উপন্যাস পাঠকদের নজর এড়িয়ে যায় না।

বাংলা ঔপন্যাসে নারী অথবা পুরুষ কার কলমে পত্র সংখ্যা বেশি সে হিসেব আপাতভাবে অবান্তর। কিন্তু পুরুষশাসিত সামাজিক অবস্থান থেকে একটি বিষয় আমাদের লক্ষ করতেই হবে, পদে পদে নিষেধের ডোরে বাঁধা নারীর জীবনে পত্রই বহু ক্ষেত্রে তার নিগূঢ় আবেগ প্রকাশের বাঞ্ছিত মাধ্যম। অথচ একথা তো ভুললে চলবে না যে নারীকে আত্মোন্মোচনের সুযোগ দিতে আমাদের সমাজে অনেকটাই দেরী হয়ে গেছে।

বিদ্যার দেবী স্বয়ং নারী হলেও বিদ্যাচর্চার অধিকার নারীকে দেওয়া হয় নি। বরং কালি-কলম আর মনের সংযোগ ঘটলে জীবন অভিশপ্ত হতে পারে এমন অযৌক্তিক বিধানেই নারীকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধবার চেষ্টা করা হয়েছে। অশিক্ষা অথবা মানসিক পরিশীলনের অভাবে যথাযথ ও সুচারু অভিব্যক্তিপূর্ণ পত্র লিখনের অক্ষমতা নারীর জীবনে সংকট অতিক্রমের পথে একটি বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ঔপন্যাসিকের লিঙ্গভেদ অর্থাৎ পুরুষ অথবা মহিলা উপন্যাসকারের সৃষ্ট চরিত্রে লিপি লিখনের বৈশিষ্ট্যগত ভিন্নতা আসে কিনা অথবা কতটা আসে তাও অনেক সময় আমাদের পর্যবেক্ষণের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলা উপন্যাসের বিস্তৃত এবং অন্তরঙ্গ পরিক্রমায় পত্র ব্যবহারের বিচিত্র রীতি পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে পত্রের সংখ্যা-প্রাচুর্য সজাগ পাঠকের বিস্ময় আকর্ষণ করে। অথচ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক কোনো সমীক্ষার উদ্যোগ এ পর্যন্ত আমাদের নজরে পড়ে নি। আর সেই কারণেই উপন্যাসের অন্যতম শিল্প উপাদান হিসেবে পত্রের গুরুত্ব অন্বেষণ আমাদের আলোচনার লক্ষ্য। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি পত্রোপন্যাস আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়। বাংলা উপন্যাস তার উদ্ভব লগ্ন থেকে প্রায় দেড়শো বছরের কালসীমাকে ছুঁতে চলেছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের প্রতিটি পর্যায়ের প্রত্যেক ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করলে প্রয়োজনীয় মনোযোগ অথবা যোগ্য বিচার না হওয়ারই আশঙ্কা থেকে যায়। তাই নির্দিষ্ট কালপরিধি বেঁধে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে বিশ শতকের মধ্যপর্ব, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে স্বাধীনতার কাল পর্যন্ত মুখ্য ঔপন্যাসিকদের আমরা পর্যবেক্ষণের গন্ডীতে এনেছি। নির্ধারিত পর্বের সঙ্গে উনিশ শতকের বিবিধ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন অন্বিত তেমনি বিশ শতকের এই সব আন্দোলনের সম্প্রসারিত রূপ এবং নবোদ্ভূত জটিল প্রেক্ষাপটে ঘনঘন জীবনের রূপবদল, মূল্যবদল এসব কিছু সম্পর্কে একটি সজাগ অনুসন্ধিৎসা আলোচনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে বাধ্য। উনিশ শতকের নবস্ফুট যুগলক্ষণ হিসেবে যে মানবপ্রত্যয় বা মানবতাবাদ অভিনন্দিত হয়েছিল, তার মূল নিহিত ছিল সমাজের বিপর্যয়রোধকারী এক সার্বিক চৈতন্যে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিমুক্ত ধারণা এই যুগের কথাসাহিত্যে স্বভাবতই সামগ্রিক প্রতিষ্ঠা পায় নি। সমষ্টিগত কল্যাণ ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার বিসর্জনের মধ্যেই যে সমাধানের পথ খোঁজা হয়েছিল তা উপন্যাসে এবং উপন্যাসধৃত পত্রাবলীর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। বিষয়টি বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় নারী-পুরুষের অবস্থানজনিত দ্বান্দ্বিকতার কারণে। উনিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে প্রচলিত সামন্তপ্রথা বিরোধী যে সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলন সংগঠিত করার চেষ্টা হয়েছিল তার অধিকাংশই ছিল নারীমুক্তিকেন্দ্রিক। সহমরণ-প্রথা নিরোধ থেকে শুরু করে বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ এবং বিধবা বিবাহের সপক্ষে যুক্তি ও আইনের সমর্থন সংগ্রহের চেষ্টা যেমন ছিল, তেমনি ছিল এর বিরুদ্ধে অবরোধ সৃষ্টিকারী সংরক্ষণপন্থী সমাজের সক্রিয় ভূমিকা। এই বিবিধ আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়ার কিছু কিছু ঢেউ এসে লেগেছিল কথাসাহিত্যের বিষয় ভাবনায়। তার স্পন্দন উপন্যাসে লগ্নিত পত্রপুটেও লভ্য। প্রথমে অন্দরমহল এবং তারপর শতাব্দীর দ্বিতায়ার্ধে ধীরে ধীরে বহির্বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ নারীকে শুধু আত্মপ্রকাশের অবকাশ দেয় নি তার ব্যক্তিত্বেও নতুন উদ্ভাস এনেছিল। এই ব্যক্তিত্ব উপন্যাসে উপস্থাপিত পত্রের ভাষা এবং ভাবনায় কতটা প্রতিবিম্বিত তা অবশ্যই আমাদের দ্রষ্টব্য বিষয়। সেদিন সমকালীন সমাজে নারীর যে প্রার্থিত মুক্তি পারিপার্শ্বিক নানা সীমাবদ্ধতার কারণে অনায়ত্ত ছিল তাকেই আদর্শ মডেল হিসেবে স্থাপন করার চেষ্টা হয়েছিল ঐতিহাসিক পটপ্রেক্ষায় চরিত্রের কল্পিত অবয়বের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, সেখানেও পত্রমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার আমাদের জন্য অন্বেষণের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তৈরী করেছে। বিশ শতকের সরণীতে এসে নারী তার শিকলের বোঝা নামিয়ে ফেলতে পেরেছে এমন নয়, কিন্তু চলাটা আগের চেয়ে স্বচ্ছন্দ হয়েছে। মুক্তির পথগুলোকে পুরুষের নেতৃত্বের প্রবর্তনায় নয়, নিজেদের তাগিদেই একটু একটু করে চিনতে

শিখেছে। স্বদেশী আন্দোলন এমন কি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনেও সে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। জীবিকা সংগ্রহের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন তাকে ঘরের বাইরে ভিন্নতর কতকগুলি সংকটের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এসবেরই প্রভাব প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য হয়েছে উপন্যাসের পত্রোপকরণের ব্যবহার বা নির্মাণে।

বাংলা উপন্যাসে পত্রের প্রয়োগগত মূল্যায়নের আমরা যে সময়সীমা নির্বাচন করেছি তার সবটাই ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার অন্তরীণ এবং সেই কারণেই তার পায়ে পায়ে অনতিক্রম্য জটিলতার শৃঙ্খল। পরপদানতজাতির চিন্তায় স্বাধীনতা সম্ভব নয়, স্বচ্ছতা সম্ভব নয়, স্ববিরোধ থেকে মুক্তিও অসম্ভব। বিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে বৈশ্বিক ইতিহাসের জটিল পরিস্থিতি, ঘটনার প্রতিঘাতে মুহুর্মুহু চালচিত্রের পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেরা লগ্নিত হতে চাওয়া অথবা শৃঙ্খলিত যাপনের মধ্যে প্রত্যাশিত অগ্রগমনের সুযোগ বা স্বস্তি খুঁজে না পাওয়া এই সব যন্ত্রণা বাঙালির ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক জীবনকে চূড়ান্তভাবে বিপন্ন করেছিল। বাংলা কথাসাহিত্য বিবর্তিত হয়েছিল এই বহুস্তরিক জটিলতার মধ্যে। বিশ শতকের প্রথম পাঁচটি দশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক শীর্ষচিহ্নিত ঘটনা হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধের মধ্যপর্বে সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কয়েকটি সন্ধিচুক্তির আপাতপ্রলেপের ভিতর থেকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের নগ্ন মূর্তির প্রকাশ এবং পরিণামে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে যুগান্তকারী ভাবনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্ব। মানসিক চেতন সত্তার অন্তরালবর্তী অবচেতন, যার উৎসমূলের যৌনানুভূতিকেই যাবতীয় অভিপ্রায়ের নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা কর হয়েছিল, তার অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ নরনারী সম্পর্কের বহুকাল লালিত যাবতীয় রোমান্টিক আচ্ছাদনকে উড়িয়ে দিল। শুরু হল কথাসাহিত্যের নতুন প্রকল্প। বলা বাহুল্য, এ ধরনের অভিনব পটপ্রেক্ষায় উপন্যাসের অন্তর্গত পত্রাবলীও পরিবর্তিত মনস্তাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার্য। স্বদেশীয় পটভূমিতে শতাব্দীর গোড়ায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বদেশী আন্দোলনের আবেগময় বিস্তার, বিপ্লবী আন্দোলনের সমান্তরাল একটি প্রবাহ, গান্ধীজীর জননেতৃত্ব গ্রহণ ও বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগের কর্মসূচী, ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা এবং বুদ্ধিজীবী মহলে মার্কসবাদী চেতনা ক্রমপ্রসার — কোনো কিছুরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবের বাইরে ছিলেন না আমাদের কথাসাহিত্যিকেরা। মার্কসবাদী রাজনীতিতে যাঁরা সরাসরি যোগ দেন নি তাঁরাও চলতি হাওয়ার টানে সমাজের প্রান্তিকায়িত মানুষদের কাহিনির সীমারেখার মধ্যে নিয়ে আসতে শুরু করেছিলেন, তার ফলেই শুরু হল আঞ্চলিক উপন্যাস। এভাবেই বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাওয়ার পথে এবং নতুন নতুন রূপরীতি বা আঙ্গিক সন্ধানের পথে বাংলা উপন্যাস পূর্বের ব্যবহৃত উপকরণগুলোকেও সময়ের অনুষঙ্গে কিভাবে পৃথক তাৎপর্যে অন্বিত করতে আগ্রহী হয়েছে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা আমাদের অন্বিষ্ট বিশেষ উপকরণটির প্রয়োগ-সাফল্য অথবা বিফলতার দিকগুলি যথাযথভাবে সন্ধান করে নেওয়ার চেষ্টা করব।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা নির্বাচিত কালপর্বের ঔপন্যাসিকদের বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করে নিয়েছি। তার মধ্যে একক ব্যক্তিত্বের জন্য কখনো কখনো একেকটি সমগ্র অধ্যায় নির্ধারিত হয়েছে। যেমন - প্রথম তিনটি অধ্যায় জুড়ে আছেন বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও বিকাশ যুগের তিন স্তম্ভপুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র। চতুর্থ অধ্যায় থেকে একক ব্যক্তিত্বের আধিপত্যের বদলে আমরা গোষ্ঠীগত প্রবণতাকে ধরবার চেষ্ঠা করেছি। আর তাই নতুন পালাবদলের নিয়ামক হিসেবে কল্লোলগোষ্ঠীর লেখকেরা এসেছেন চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনামে। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা ত্রয়ী ব্যক্তিত্বকে সমন্বিত করেছি, বিশেষ গোষ্ঠী হিসেবে নয়, বরং কল্লোলের সমান্তরালে উঠে এসে শিল্পীর নিজস্ব ধাতু-প্রকৃতির ভিন্নতার যাঁরা স্বতন্ত্র তিনটি ধারা-স্রোতে দাঁড়িয়ে আছেন। এঁরা হলেন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আবার বাঁক্

পরিবর্তন এবং এবারেও তা একটি সম্মিলিত প্রয়াসের ফল। মননপ্রধান ঔপন্যাসিক হিসেবে এই অধ্যায়ের অন্তর্গত হয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, দিলীপ কুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার। সপ্তম তথা শেষতম অধ্যায়টি সমর্পিত হয়েছে মহিলা ঔপন্যাসিকদের নামে। উনিশ শতকের সমাপ্তি পর্ব থেকেই ধীরে ধীরে বাংলার সারস্বত ক্ষেত্রে নিজেদের পায়ের তলার জমিটা তাঁরা খুঁজে নিতে শুরু করেছিলেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে সংখ্যাগত দিক থেকে খুব বেশি নারী ঔপন্যাসিকের দেখা না পাওয়া গেলেও পুরুষতান্ত্রিক আবহের ভিতর থেকে নারীর নিজস্ব কণ্ঠস্বরটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা তাঁরা শুরু করেছিলেন। পুরুষদের নির্ধারিত বিধানের ঘেরাটোপকে তেমনভাবে অগ্রাহ্য করতে না পারলেও ক্রমসঞ্চিত একটি ক্ষোভ ভিতরে ভিতরে বিস্ফোরনের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলছিল। তাই নারী ঔপন্যাসিক হিসেবে স্বর্ণকুমারী দেবী থেকে শুরু করে নিরুপমা, জ্যোতির্ময়ী, পূর্ণশশীদের কলমে চিঠির ক্ষেত্রে নতুন কোনো মাত্রা সংযুক্ত হয়েছে কিনা তারও সন্ধানে আমরা তৎপর হয়েছি। ভূমিকা এবং উপসংহার মিলিয়ে মোট নয়টি অধ্যায়ে বিস্তারিত আমাদের সামগ্রিক সমীক্ষা। অনেক নামী লেখকের নামী ঔপন্যাসও হয়ত আমাদের আলোচনার বাইরে রয়ে গেছে। তার কারণ একটাই। সেগুলি নিষ্পত্র উপন্যাস।

ঃ তথ্যসূচী ঃ

১। কালিদাস - অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, তৃতীয় অঙ্ক, শকুন্তলার পত্র, ১০ সংখ্যক শ্লোক - ডঃ সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, পরিবর্তিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ২১৬।

২। তারাকান্ত কাব্যতীর্থ - শ্রীমদ্ভাগবত, দশম স্কন্ধ, বাহান্ন অধ্যায় ৩৭ শ্লোক, পি. এম. বাকচি অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা - ৩৪০।

৩। কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী - চণ্ডীমঙ্গল (বণিক খন্ড) বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৬৬, পৃষ্ঠা - ৪৪।

৪। তদেব পৃষ্ঠা - ২০৩।

৫। কৃষ্ণদাস কবিরাজ - চৈতন্যচরিতামৃত, সুকুমার সেন সম্পাদিত লঘু সংস্করণ, সাহিত্য একাদেমী, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা - ৬০৫।

৬। সুখময় মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত) ময়মনসিংহগীতিকা, "চন্দ্রাবতী",প্রথম:পৃষ্ঠা - ১৬০। সংস্করণ, ১৯৯১, ভারতী বুক স্টল ।

৭। দ্রষ্টব্য, দেবীপদ ভট্টাচার্য - উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত প্রথম দে'জ সংস্করণ - ২০০৩ ।